মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং-২৭২
২৪তম বর্ষ
১০ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ী

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

আফগানিস্তানের হেরাত-এ অবস্থিত বিশিষ্ট সুফিসাধক হযরত শাইখ আবু ইসমাঈল আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী (রহঃ)'র রওজা শরিফ।

৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নগরীর 'রীমা কনভেনশন সেন্টার'এ **SZHM Trust**-এর ব্যবস্থাপনায় 'মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ' এর শাখা কমিটি সমূহের 'বার্ষিক সম্মেলন-২০১৮'। মঞ্চে উপবিষ্ট (ডান থেকে) ট্রাস্ট সচিব এ এন এম এ মোমিন, কেন্দ্রিয় সভাপতি আলহাজ্ব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী, সহ-সভাপতি অধ্যাপক এ ওয়াই এম জাফর ও সৈয়দ ফরিদ উদ্দিন।

'বার্ষিক সম্মেলন-২০১৮' উপস্থিত দেশ-বিদেশের শাখা কমিটিসমূহের সদস্যবৃন্দের অংশ বিশেষ।

মাইজভাণ্ডারী একাডেমির ১২১তম মাসিক রূহানী সংলাপে বক্তব্য রাখছেন চ.বি আরবি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ নুর হোসাইন।

SZHM Trust পরিচালিত 'দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প' (পাইলট প্রকল্প-২)-এর উদ্যোগে চলমান 'দক্ষ নারী উন্নয়ন কমসুচি'র অংশ হিসেবে সিলেট অঞ্চলের মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ বেজুড়া শাখা, হাতির থান শাখা, সুলতান সি শাখা, বগলা বাজার শাখা ও মৌলভী বাজার বড় হাট শাখার উদ্যোগে ১১টি 'সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' চালুর মাধ্যমে মোট ১১টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।

বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর ৩০তম উরস্ শরিফ উপলক্ষে 'মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে মাসব্যাপী জনসেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বা'দ জুমা নগরীর মাঝিরঘাট বিবি মসজিদ-এ 'মরদেহ সংরক্ষণ-আইস বক্স' প্রদান করা হয়।

মাসিক
আলোকধারা
THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং ২৭২, ২৩তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮ ঈসায়ী
মুহররম-রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরি
আশ্বিন-পৌষ ১৪২৫ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

যোগাযোগ:
লেখা সংক্রান্ত: ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
US $=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web:www.sufimaizbhandari.org.bd
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ **সম্পাদকীয়:** ----------২
■ **তাহকীকুল কুরআন ঃ সূরা আল বাক্বারাহ শরীফ** (পর্ব-১১)
অধ্যক্ষ আল্হাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী
----------৩
■ **গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জন্মভূমির পরিচয়**
জহুরুল আলম----------৭
■ **তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে**
জাবেদ বিন আলম----------১৪
■ **শতাব্দীর কাল-পরিক্রমায় শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী [এক মহাকাব্যিক আধ্যাত্মিক অভিধানের কথকতা]**
ড. সেলিম জাহাঙ্গীর----------১৭
■ **বিশ্বময় নারী নির্যাতন**
মোঃ মাহবুব-উল আলম----------২৮
■ **ফিহি মা ফিহি : মাওলানা রূমীর উপদেশবাণী**----------৩৭
■ **ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র শজরার উর্ধ্বতন তৃতীয় শায়খ শামসুল আস্ফিয়া আল্লামা লাক্বীতুল্লাহ আলাইহির রহমাহ্**
মুহাম্মদ রবিউল আলম----------৪২
■ **শিশু-কিশোর মাহফিল**----------৪৫

স ম্পা দ কী য়

আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের মর্যাদাপূর্ণ অধ্যায় 'তাসাওউফের' আলোকে আলোকিত হওয়ার প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণার বাস্তব রূপায়নের প্রতিফলিত রূপ- মাসিক 'আলোকধারা'। আমাদের মেধা-মননের উৎকর্ষতার প্রতীক মাসিক আলোকধারার এবারের সূচনা-পর্ব পবিত্র কুরআনের তাফসীরের মাধ্যমে।

এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়: সূরা বাকারার কয়েকটি বিষয়: যেমন (১) ইহসান সংক্রান্ত নির্দেশনা, (২) হজ্ব ও ওমরার বিধান (৩) মুমিনের প্রার্থনার ধরণ, (৪) ইসলামে পূর্ণাঙ্গ অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গ।

অধ্যাপক জহুর উল আলমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ: গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জন্মভূমির পরিচয়।

জাবেদ বিন আলমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ: তাওহীদের সূর্য: মাইজভাণ্ডার শরিফ: বেলায়তে মোত্লাকার উৎস সন্ধানে।

আগামী ২৬ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র উর্স শরিফ। এ উপলক্ষ্যে ড. সেলিম জাহাঙ্গীর নিবেদিত প্রবন্ধ: শতাব্দীর কাল পরিক্রমায় শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী: এক মহাকাব্যিক আধ্যাত্মিক অভিধানের কথকতা।

শিশু-কিশোর মাহফিল অধ্যায়ে থাকছে কুরআন-হাদিসের গল্প ও ছোটদের কুরআন অভিধান।

মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর উপদেশ বাণী: ফীহি মা ফিহি।

সাংবাদিক মোঃ মাহবুব উল আলমের নারী বিষয়ক ধারাবাহিক প্রবন্ধ : বিশ্বময় নারী নির্যাতন।

ত্বরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র শজরার ঊর্ধ্বতন তৃতীয় শায়খ শামসুল আস্ফিয়া আল্লামা লাক্বীতুল্লাহ (রঃ) বিষয়ে উপস্থাপনা আলোকধারার পাঠক সমাজকে ঋদ্ধ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে নতুনভাবে।

প্রচ্ছদের ভিতরের পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে দরবার ও ট্রাস্ট সংশ্লিষ্ট সমকালীন কর্মকাণ্ডের কিছু চলমান চালচিত্র।

আগামী ১২ রবিউল আউয়াল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী, ১১ রবিউস সানি হযরত গাউসুল আযম শেখ আবদুল কাদের জিলানীর ফাতেহা ইয়াজদহম, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস এবং ১০ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) ৯০তম পবিত্র খোশরোজ শরিফ। এ দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্যাপন করা হবে।

আলোকধারা গত সংখ্যায় সৈয়দ লুৎফুল হক ফরহাদাবাদীর একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার ছাপানো হয়েছে। আর এ সংখ্যা প্রকাশের পূর্বেই তিনি ওফাত প্রাপ্তহন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নাইলাইহি রাজিউন) আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং পরিবার-পরিজন ও দরবারী আশেক-ভক্তগণের প্রতি একান্ত সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বহুমাত্রিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়াদিকে স্পর্শ করে প্রদত্ত ঐ ইতিহাস-সংশ্লিষ্ট সাক্ষাৎকারের কিছুবিষয় ইতোমধ্যে পাঠক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

পাঠকের মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি হলো, অছিয়ে গাউসুল আযমকে কেন্দ্র করে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ওফাতকালীন সময়ের একটি ঘটনা। উল্লেখ্য, জনশ্রুতি সূত্রে প্রাপ্ত এ তথ্য ইতিহাসের আলোকে প্রশ্নাতীত নয়। আমাদের বিবেচনায় বিষয়টি আরো বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

এ বিষয়সহ সাক্ষৎকারে বর্ণিত যে কোন তথ্য-উপাত্ত বিষয়ে কারো কোন অভিমত থাকলে তা আলোকধারা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, একইসাথে প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত লিখিতভাবে সরবরাহ করে আমাদের সহযোগিতা করার জন্যও বিনীত অনুরোধ করছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ এবং ইচ্ছার অনুকূলে নিজেদের পরিপূর্ণমাত্রায় সমর্পিত করার ধারায় আত্মউপলব্ধির জগতকে মননের একান্ত গভীরে তাত্ত্বিকভাবে প্রতিস্থাপন এবং নিজেদের প্রতিনিয়িত শাণিত রাখার নিরন্তর প্রয়াস সৃজনশীলভাবে অব্যাহত রাখার একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের পদযাত্রায় আস্থা ও বিশ্বাসের 'বাতিঘর' রূপ আলোকবর্তিকা হিসেবে 'আলোকধারা'র সাথেই থাকুন। অন্তর্চক্ষুর উন্মিলনে "তাসাওউফ" জগত পরিভ্রমণে নিজেকে ঋদ্ধ করুণ পলে পলে। ❑

তাহ্কীকুল কুরআন

সূরা আল্-বাক্বারা শরীফ (পর্ব-১১)

• অধ্যক্ষ আল্হাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী •

[বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক অধ্যক্ষ আল্হাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রণীত তাফসীর-এ-সূরা ফাতিহা শরীফ মাসিক আলোকধারায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পর্বে ক্রমশঃ সূরা আল বাক্বারা শরীফের তাফসীর প্রকাশ করা হচ্ছে।]

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আলহাম্দু ওয়াস্সানাউ ওয়াশ্শুক্রু লিল্লাহিল্লাজী নাওয়ারানা বিনূরিল ঈমান, ওয়া আফ্দ্বালুস্সালাতু ওয়া আয্কাস্সালামু ওয়া আহ্সানুত্তাহ্ইয়াতু আলা মান খাস্সাহু বিল্ কুরআন, আল্লাজী লাইছা লাহু নজীরুন ওয়া লা মিচালুন ওয়া লা চান। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহ্লি বাইতিহী ওয়া আস্হাবিহিল্লাজীনা ক্বামূ বিল্ ফুরক্বান, ওয়া আলা আত্বায়ুল্লাজীনা তাবিয়ুহুম বিল্ ইহ্সান, বিল্ খসুসি আলা গাউসুল আযম আশ্শাহ আস্সূফী আস্সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ আল্মাইজভাণ্ডারী ওয়া গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবাভাণ্ডারী আশ্শাহ আস্সূফী আস্সৈয়দ গোলামুর রহমান, ওয়া আলা আওলাদিহীমা ওয়া আহ্লি ত্বরীক্বাতিহীমাল্লাজীনা সাবাকূনা বিল্ ঈমান। আম্মাবাদ.....

মুমিনদের প্রার্থনার ধরণঃ ২০১ নং আয়াতের প্রারম্ভে একটি উত্তম দোয়া মুমিনদের প্রার্থনা রূপে স্বীকৃতি দিয়ে তা উত্তম দোয়া বলে প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা মাজদুহু। বলা হয়েছে, রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাছানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াকিনা আযাবান্নার' অর্থাৎ তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে- হে পরওয়ারদিগার' আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণদান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের 'আযাব থেকে রক্ষা কর।' এটি মুমিনের জন্য খুবই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ দোয়া। ২০০ নং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- 'তারপর অনেকে তো বলে যে, হে পরওয়ার দিগার! আমাদেরকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই। উক্ত আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রার্থনাকারীদেরকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণী হচ্ছে কাফির ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে মুমিন। যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখিরাতের কল্যাণও কামনা করে।

ইসলামে পূর্ণাঙ্গ অন্তর্ভূক্তি ঃ ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, 'ইয়া আইউহাল্লাজীনা আমানুদখুলু। ফিস্সিল্মি কাফফাহ ওয়ালা তাত্তাবিয়ু খুওয়াতিশ শাইতান।' অর্থাৎ- হে ঈমানদার গণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।'

এ পবিত্র আয়াতের তিন ধরণের বিশ্লেষণ হতে পারে। (১) তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্ক, সবকিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত পা এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ অথচ তোমাদের মন-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে; কিন্তু হস্ত-পদাদি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে। (২) তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ- এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। (৩) এতে এ অর্থও বিদ্যমান যে, তোমরা শুধু মুখে ঈমান এনেছ বল্লে; কিন্তু অন্তরে ঈমান আক্বীদা পোষণে বাতিল ফিরকার অনুসরণ করলে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা বা ধর্মমত অন্তরে দৃঢ়মূল করতে সন্দেহের আশ্রয় নিলে; এমতাবস্থায় সেই দৃশ্যতঃ ঈমান আনার কোন মূল্য নাই, সুন্নী আক্বীদা সমূহ অকপটে মন-মস্তিস্কে ধারণপূর্বক পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। কেননা একমাত্র সুন্নী আক্বীদাই একজন প্রকৃত মুমিন-মুসলমান এবং কপট-মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করতে সক্ষম। সুতরাং যে পর্যন্ত ইসলামের সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত প্রকৃত মুসলমান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেনা।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ যেখানে শয়তানের পদাংক অনুসরণে বারণ করা হয়েছে, তার বিশ্লেষণে বলা যায়, যারা শয়তানের মতো বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়ে মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে অন্তরের বাতিল আক্বীদা প্রকাশ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, এমনকি সুযোগ পেলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও দখল করতে

সচেষ্ট, তাদেরকে অনুসরণ, তাদের আক্বীদা বা ধর্মমত গ্রহণ, তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান, তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, তাদেরকে ইমাম বানানো, তাদের পেছনে নামায পড়া, তাদেরকে নেতার আসনে বসানো, তাদের কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া, তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন, তাদেরকে হৃদয়ে স্থান দেয়া, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের কাছ থেকে কোনো উপদেশ গ্রহণ, তাদের বই-পুস্তক পাঠ করা, তাদেরকে শারীরিক-মানসিক কিংবা আর্থিক সাহায্যসহযোগিতা প্রদান, এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য উক্ত আয়াতে আল্লাহপাক প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ নামায বর্জন করা যেমন শয়তানের পদাংক অনুসরণ, তেমনি বাতিল আক্বীদা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে নামাযে ইমামতি করতে দেয়াটাও শয়তানের 'পদাংক অনুসরণ'। সদকা-খয়রাত না করা যেমন শয়তানের পদাংক অনুসরণ, তেমনি বাতিল ফিরকার লোকদের যে কোনো কর্মে যে কোনো ধরনের অর্থ অনুদানও শয়তানের পদাংক অনুসরণ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, ওয়া তায়াওয়ানু আলাল বিররি ওয়াত তাকওয়া ওয়ালা তায়াওয়ানু আলাল ইছমি ওয়াল উদওয়ান' (সূরা মায়িদাহ : ২)। অর্থাৎ তোমরা সৎ ও খোদাভীরুতার কাজে পরস্পরকে সাহায্য করো আর পাপ ও সীমা লংঘনে একে অপরকে সাহায্য করো না।

প্রিয়নবী (দ.)'র গাধার প্রতিও কুমন্তব্য অবাঞ্ছনীয় ঃ ইসলামের মহান নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রতি তিলমাত্র অশোভন আচরণও ধর্মচ্যুতির কারণ। উদাহরণ স্বরূপ এ হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলে আপনি যদি আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ের কাছে একটু যেতেন (তবে ভালো হতো)। নবীকরীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যাওয়ার জন্য গাধায় (সম্মানার্থে দীর্ঘকর্ণ বিশিষ্ট) আরোহন করলেন এবং মুসলিমগণ তার সঙ্গে হেঁটে চলল। আর সে পথ ছিল কংকরময়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এসে পৌছুলে সে বলল, সর! আমার সম্মুখ থেকে। তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তাদের মধ্য থেকে একজন আনসারী বলল- আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামার গাধা সুগন্ধে তোমার চাইতে উত্তম। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর গোত্রের একব্যক্তি রেগে উঠলো এবং একে অপরকে গালাগালি করলো। এভাবে উভয়পক্ষের সঙ্গীরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং উভয় দলের সাথে লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি হলো। আমাদের জানানো হয়েছে যে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলো। "মোমিনদের দু'দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেবে।" (সূরা ঃ ৪৯ : ৯) ইমাম বুখারী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন- মোসাদ্দাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বসার এবং হাদিস বর্ণনার পূর্বে আমি তার থেকে এ হাদিস হাসিল করেছি। (সুত্রঃ বুখারী শরীফ- কিতাবুস সুলহি, হাদিস নং ২৫১২, বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। প্রতীয়মান হয়, যেক্ষেত্রে রাসূলে পাকের (পবিত্র) গাধাকে তিরস্কার করাটা অসমীচীন সাব্যস্ত হয়েছে, সেখানে স্বয়ং রাসূলে পাকের প্রতি কোনোরূপ অশোভনীয় আচরণ কী ধর্মচ্যুতির কারণ নয়?

বিশেষ জ্ঞাতব্য: উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী বিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, সুন্নী মতাদর্শ-সুন্নী আক্বীদা বিশ্বাসকে ইসলামের পূর্বশর্ত এবং প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেম-ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধাকে ঈমানের পূর্বশর্ত বলে বিশ্বাস করেনা বা মেনে নেয়না তাদের ক্ষেত্রে উক্ত আয়াতখানা কঠিন সতর্কবাণী হিসেবে বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত দ্বীনদার বেশভূষা ধারীদের মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি অধিকাংশভাবে পরিলক্ষিত হয়। এরা ধর্মীয় নীতি-বিধান এর প্রতি যেমন ভ্রুক্ষেপ করেনা, তেমনি প্রকৃত ঈমান সুন্নী আক্বীদার প্রতিও বিশ্বাসী নয়। এসব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ বা অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। তাই তারা পথভ্রষ্ট ও বাতিল দলভূক্ত। আল্লাহ পাক তার হাবীবের উসীলায় সবাইকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাতের আক্বীদা বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ার তওফিক দান করুন। এতদভিন্ন সুন্নী মতাদর্শ কোন রাজনৈতিক দল পাওয়া গেলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঐ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আনার প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর অপরিহার্য কর্তব্য। এ বিষয়টিও অত্র আয়াতের অন্তর্নিহিত ভাবধারায় বিদ্যমান।

সৃষ্টির আদিতে মানব ছিল এক জাতি: ২১৩ নং আয়াতের প্রারম্ভে বলা হয়েছে- 'কানান্নাছু উম্মাতাঁও ওয়াহিদাতান' অর্থাৎ- সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যাচ্ছে যে, সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহ্বান করেছেন। যারা তাদের এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তারা এক জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে। এ

একক জাতীয়তার ভিত্তি ছিল আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদ। পরবর্তীতে মতাদর্শ, আকায়েদ ও ধ্যানধারণার পার্থক্যের কারণে মানুষ সঠিক আক্বীদা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণের এবং আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে। এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেয়া উচিৎ নয়। যেভাবে কাফিরেরা তাদের পূর্ব পুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মু'মিন, সুন্নী মুসলিম ও ওলামা-মশায়েখের উচিৎ নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ-নসীহত এবং নম্রতা-ভদ্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য ধর্মমত আহলে সুন্নাতের প্রতি আহ্বান করতে থাকা। এ কথা বলা যে, কুফরী ও মুনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। বাতিল ফিরকা বা ভ্রান্তদলের দলমত ত্যাগ করে ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা পোষণ কর, কেননা সেটাই হলো নবী করীম ঘোষিত একমাত্র নাজী ফিরকা বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল।

কষ্ট অনুপাতে জান্নাতের স্তর ধার্য হয়: পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশত লাভ করতে পারবে না। অথচ পবিত্র কুরআন-হাদিসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাপী ব্যক্তিও আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার বদৌলতে জান্নাত লাভ করবে, এতে কোন কষ্ট সহ্যের প্রয়োজন হবেনা। কারণ কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্ন স্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আক্বীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা ভেদে যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। হাদিসে পাকে এসেছে, রাসূলে পাকের ঘোষণা 'আশাদুন্নাসি বালাআল আম্বিয়া' অর্থাৎ সবচাইতে অধিক বালা-মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ।'

কুরআনে কারীমে প্রশ্নোত্তর: শরীয়তের যেসব হুকুমআহকাম সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র কুরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় ১৭টি স্থানে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ৭টি সূরা বাক্বারায়, ১টি সূরা মায়িদায়, ১টি সূরা আনফালে। এ ৯টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আ'রাফে ২টি এবং সূরা বণী ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সূরা তাহা ও সূরা নাযিআতে ১টি করে ৬টি স্থানে কাফিরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল যার উত্তর কুরআনে করীমে উত্তরের আকারেই দেয়া হয়েছে।

সাহবাগণ উত্তম দল ঃ রইছুল মুফাস্‌সিরীন বা কুরআন বিশ্লেষক বৃন্দের সম্রাট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি দেখিনি, ধর্মের প্রতি তাদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি তাদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্বেও তারা প্রশ্ন করতেন খুব অল্প। তাঁরা সর্বমোট ১৩টি বিষয়ের উপর প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কুরআনে করীমে দেয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রশ্ন করতেন না। (সূত্র: কুরতুবী)।

মওদুদির ভ্রান্ত মতবাদ: জামায়াতে ইসলামী নামে একটি নামধারী ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানের পাঞ্জাব এর অধিবাসী সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তার লিখিত পুস্তক গুলোতে সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করে লিখেছে (ক) রাসূলে খোদা ব্যতীত অন্য কেউ চাই তিনি নবী হউন অথবা সাহাবা হউন সত্যের মাপকাঠি হতে পারেন না।' (খ) রাসূলে খোদা ব্যতীত অন্য কাকেও সমালোচনার উর্ধ্বে স্বীকার করা যাবে না।' এসব উক্তি পূর্বক তিনি সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, মুহাদ্দেসীনে কেরাম ইত্যাদি কেউ হক্ব বা সত্যের মাপকাঠী নন। তাদের কারো মতাদর্শ অনুসরণযোগ্য নয়। অবাধে তাদের সমালোচনা করা যাবে। (গ) ওলামা-মশায়েখ ও মুফতী সাহেবগণ সকলেই গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট। তারা সবাই জাহিলদের মতই ইসলামের হাকীকৃত সম্পর্কে অজ্ঞ। (সূত্র: দস্তুরে জামায়াত, পৃ:২৪, তাফহীমাত- ১ম খন্ড, পৃঃ৩৬, সিয়াসী কশমকশ- ৩য় খন্ড, পৃ:৭৭, তরজুমানুল কুরআন দ্রষ্টব্য) প্রকৃত পক্ষে তিনি এ ধরণের ইসলাম বিরোধী ফতোয়া প্রদান করে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন।

জিহাদ প্রসঙ্গে: ২১৬নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন'কুতিবা আলাইকুমুল ক্বিতাল।' অর্থাৎ- "তোমাদের উপর ধর্মযুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে।' এ আয়াত দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর যে ফরজ তা পরিস্কার বুঝা

যাচ্ছে। তবে কুরআনে পাকের কোন কোন আয়াত ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিসে পাকের বর্ণনাতে বুঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরজ ফরজে আইন রূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না, বরং এটা ফরজে কিফায়া। ফলে যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরজ আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানকেই ফরজ থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হতে হবে।

জিহাদ ফরজে কিফায়ার প্রমাণঃ কুরআনে করীমের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ফাদ্দালাল্লাহুল মুজহিদীনা বি আমওয়ালিহিম ওয়া আনফুছিহিম আলাল কায়িদীনা দারাজাতান ওয়া কুল্লাঁও ওয়াদাল্লাহুল হুছ্না' অর্থাৎ- 'আল্লাহ তা'য়ালা প্রাণ এবং সম্পদের দ্বারা জিহাদকারীগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এতে যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্যে বা অন্য কোন ধর্মীয় খিদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরজে আইন হতো তবে তা বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো না। (সূত্রঃ তফসীর মাআরেফুল কুরআন- পৃঃ ১১০)

তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বল্লো, জি, বেঁচে আছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি পিতা-মাতার খিদমত করেই জিহাদের সওয়াব হাসিল কর। অধিকাংশ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ও হাদিস বেত্তাগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরজে কিফায়া।

জিহাদে আকবরঃ তাসাওউফের পরিভাষায় মাঠে ময়দানে কাফির মুশরিকদের সাথে তরবারী, নেজা, বল্লম, তীরসহ বিভিন্ন সমরাস্ত্র নিয়ে ধর্ম যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বা জিহাদ করাকে জিহাদে আসগর বা ক্ষুদ্রতম জিহাদ আখ্যায়িত করা হয়। আর আপন নফস বা কু রিপুর সাথে যুদ্ধ করা, আত্ম সংগ্রাম করাকে জিহাদে আকবর বা বৃহত্তম জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) বলা হয়। হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এসে ঘোষণা দিয়েছিলেন, রাজায়ানা মিন জিহাদিল আসগরে ইলাল জিহাদিল আকবর' অর্থাৎ- আমরা অবশ্যই ক্ষুদ্রতম জিহাদ থেকে বৃহত্তম জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। উক্ত হাদিস শরীফকে সূফী সম্রাট জ্ঞান তাপস হযরত জালালুদ্দীন রূমী রহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি তাঁর মসনবী শরীফে ফার্সী ছন্দে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে,

ই জামাঁ আন্দর জিহাদে আক্‌বরিম
ক্বাদ রাজায়ানা মিন জিহাদিল আসগরীম ॥

অর্থাৎ- বর্তমান যুগে আমরা জিহাদে আকবর বা বৃহত্তম ধর্ম যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছি, কেননা, অবশ্যই আমরা জিহাদে আসগর বা ক্ষুদ্রতম জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছি। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান কালে সকলকে আবশ্যকীয়ভাবে আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম জিহাদে আকবরে লিপ্ত থাকতে হবে। যা আওলিয়া-এ কেরামের তাসাওউফ চর্চার অন্যতম বাহন। আল্লাহ তা'য়ালার জিকিরের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়।

জিহাদের অপব্যাখ্যা নিরসনঃ কোন কোন মহল জিহাদের অপব্যাখ্যা করে বিভিন্ন ধরনের জঙ্গী গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছে। যারা মহাপাপ কর্ম নরহত্যার পথ বেছে নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। প্রকৃতপক্ষে তাদের কার্যকলাপ না ইসলাম সমর্থন করে, না তাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ নারকীয় শাস্তি। কেননা, আল্লাহ পাক কুরআনে পাকের এক আয়াতে বলেন- "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হলো জাহান্নাম' (সূরা নিসা ঃ ৯৩)।

যে জাতিতে আত্মসংগ্রামের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির প্রবণতা যত বেশী বৃদ্ধি পাবে, সে জাতি তত বেশী শান্তিতে থাকবে। কেননা, আত্মকলহ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে আত্মশুদ্ধির জন্য আত্মসংগ্রামের বিকল্প নেই। তাই জিহাদের নামে নরহত্যা নয়; দুনিয়া-আখিরাতের অবারিত সুখ-শান্তি অর্জনে চাই আত্মশুদ্ধির জন্য আত্মসংগ্রাম। হাদিসে পাকে প্রজ্ঞাবান বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "যে ব্যক্তির ক্ষতি হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে বেহেশতে যাবে না।' (মুসলিম শরীফ : ১ম খন্ড : ৭৮)। অত্র হাদিস শরীফে প্রতিবেশী বলতে কোনো বিশেষ ধর্মালম্বীর কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রতিবেশী যেকোনো ধর্ম-বর্ণ গোত্রের লোকই হোক না কেন, তার কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা হলে; ঐ ক্ষতিকারী ব্যক্তি বেহেশতে যেতে পারবে না। এখানে অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। (চলবে) ❑

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়

• জহুর-উল-আলম •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[বিশ্বঅলি গাউসুল আযম হযরত শাহ্সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের বেলাদত (জন্ম) প্রসঙ্গ।]

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি। ফটিকছড়ির একটি পরগনা মাইজভাণ্ডার। আর মাইজভাণ্ডারের কারণে বিশ্ব আধ্যাত্মিক জলসায় - এ জনপদের আকাশ ছোঁয়া পরিচিতি। মাইজভাণ্ডার গ্রামের বিশ্ব পরিচিতির সূচনা মূল হচ্ছেন 'খাতেমুল অলদ' বেলায়তে মোকাইয়াদার পরিসমাপ্তিকারী এবং বেলায়তে মোত্লাকার দ্বার উন্মোচনকারী গাউসুল আযম হযরত শাহ্সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের পবিত্র জন্মস্থান, অভ্যুদয় এবং বিকাশ প্রাপ্তির কারণে। শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (কঃ) পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই তাঁকে উপর্যুক্ত অভিধায় অভিনন্দিত করেছেন। মাওলানা তোরাব আলী কলন্দর ফার্সী ভাষায় লিখিত তাঁর কিতাব 'মতালেবে রশীদী'র ২৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, "গাউসুল আযম জীবের ত্রাণকর্তা হিসেবে খোদার হুকুমে বিল আসালত বা জন্মগত অলি আল্লাহ্ হন। তিনি 'ফরদুল আফরাদ' ও আহমদ মোস্তফা (দঃ) এর সমস্ত বেলায়তী গুণের অধিকারী এবং সুক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী। তাঁর বেলায়তের উপরে বেলায়তের অধিক কোন মর্তবা নাই। ইছমুল্লাহ্ ফরদুল আফরাদের বিশ্বাসের আল্লাহ্ শব্দ বিশিষ্ট হবে।" শায়খুল আকবর হযরত মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের ইহজগতে আত্মপ্রকাশের প্রায় ৫৮৬ বৎসর পূর্বে ৬৩৬ হিজরীতে ভবিষ্যতবাণী করে উল্লেখ করেছেন, "নবী করিম (দঃ) এর আরবে অস্তমিত রবি এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে পুনঃ উদিত হবে। তাঁর নাম থাকবে খোদার জাতি নাম 'আল্লাহ্' এর সঙ্গে সংমিশ্রিত নবী করিম (দঃ) এর বেলায়তী নাম 'আহমদ'। তাঁর জন্মস্থান ভূখণ্ড মধ্য রেখার পূর্ব পাশে অবস্থিত থাকবে। এটি চীন পাহাড়ের পাদদেশে বৌদ্ধ এবং বিভিন্ন জাতির সমাবেশ স্থল হবে। তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি হবে-নবীবর আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) পূর্ণ সাদৃশ্যতার প্রতীক। তিনি খাতেমুল অলদ হবেন। নবীবর (দঃ) এর মতো তিনি কোন পুত্র সন্তান ইহজগতে রেখে যাবেন না। তাঁর ভাষা হবে সংমিশ্রিত এক ভাবপ্রবণ ভাষা। তাঁর রহস্যময় কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি-চাল চলন সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা নিতান্তই দায় হবে।"

হযরত গাউসুল আযম শাহ্সুফি সৈযদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের পিতা সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহঃ)। তাঁর প্রথম সন্তান সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বের ঘটনা। সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, 'এক রাত্রে তিনি এশা নামাযের পর খোদার পবিত্র নাম স্মরণান্তে নিদ্রাভিভুত হলেন। স্বপ্নে দেখলেন, তিনি আলমে মালকুতে ফেরেশ্তা জগতে ভ্রমণ করছেন। অকস্মাৎ আল্লাহ্ তালার বাস্তব রহস্যদ্বার উদ্ঘাটিত হলো। তিনটি প্রদীপ আলোক তাঁর সামনে উপস্থিত হলো। এদের একটির চেয়ে অপরটি অত্যোজ্জ্বল। তন্মধ্যে একটি প্রদীপ সূর্যসম জ্যোতিস্ময়। এটির রশ্মিতে যেন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বিশ্ব জীবে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার হলো। তাদের মনে প্রাণে যেন এক অভিনব আনন্দ স্পন্দন জেগে উঠল। এতদ দর্শনে সচকিত অবস্থায় তিনি উঠে বসলেন। তাঁর মনে এক অপূর্ব আহ্লাদ উদয় হলো। এ স্বপ্ন রহস্য উদ্ঘাটনে তাঁর মন আকুল হয়ে পড়ল। কার কাছেই বা স্বপ্নের তাবির জানবেন। কে এ গুপ্ত রহস্যের তথ্য দিতে পারবে। মনে মনে স্থির করলেন, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু মৌলবী আবদুল হাদী সাহেবের নিকট এ বৃত্তান্ত বলে এর তাবির রহস্য জেনে নেবেন। তিনি অভিজ্ঞ মোত্তাকী আলেম। স্বপ্ন রহস্যের মর্ম ব্যাখ্যায় তাঁর নিশ্চয় অভিজ্ঞতা থাকবে। তাঁর মন বড়ই উদ্গ্রীব হয়ে উঠল। ভোর হলে তিনি তাঁর নিকট গেলেন। নির্জনে স্বপ্ন বৃত্তান্ত খুলে বললেন। মৌলভী হাদী সাহেব তাঁকে এ গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নের কথা আর কারো কাছে প্রকাশ না করতে নিষেধ করলেন। মওলানা হাদী সাহেব তাঁকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনা করে একটি আয়াত পাঠ করার উপদেশ দেন এবং বলেন, তাঁর পবিত্র ঔরসে তিনজন সুসন্তান জন্মগ্রহণ করবেন। প্রত্যেকে হাদী-অলি হবেন। তন্মধ্যে একজন সুবিখ্যাত বিশ্বঅলি হবেন। তাঁর আধ্যাত্মিক আলোকে সারা বিশ্ব ভূবন আলোকিত ও মোহিত হবে।" এ স্বপ্নের পর সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে বিনম্র ফরিয়াদ পেশ করতেন, আল্লাহ্ যেন তাঁর স্বপ্ন সফল করেন।

এ ধরনের অবস্থায় এক রাতে সৈয়দ মতি উল্লাহ্'র (রহঃ)

পুণ্যবতী সহধর্মিনী সৈয়দা বিবি খায়রুন্নেসা সাহেবা এক অদ্ভুত প্রাণচঞ্চল স্বপ্ন দেখে জাগ্রত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর স্বামী সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহঃ) সমীপে আনন্দপূর্ণ স্বপ্নের বর্ণনা দেন। সৈয়দা বিবি খায়রুন্নেসা উল্লেখ করেন, তাঁরা স্বামী স্ত্রী দু'জনে এক সাগর তীরে দণ্ডায়মান। অনেক লোক নৌকাযোগে সাগরের এদিক ওদিক ভ্রমণ করছেন। কেউ কেউ সাগর জলে ডুব দিয়ে কি যেন আহরণ করছেন। তাঁরাও একখানা নৌকায় আরোহন করলেন। লোকেরা মুক্তা আহরণ করছে শুনে তাঁরাও সাগর জলে ডুব দিতে লাগলেন। অতি সুন্দর চকচকে একটি ঝিনুক পেয়ে সৈয়দা খায়রুন্নেসা অতি সত্বর নৌকায় ওঠেন। ঝিনুক খুলে দেখেন অত্যোজ্জ্বল একটি মুক্তা। এ মুক্তার চাকচিক্যময় আলোকে সমস্ত নৌকা আলোকিত হয়ে পড়ে। তাঁদের অতিশয় আনন্দ দেখে সাগরে উপস্থিত সকলে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সকলে 'মারহাবা' রবে তাঁদেরকে অভিনন্দিত করতে থাকে। এরপর আরো দুটি মুক্তা আহরণ করেন। সকলে অবাক বিস্ময়ে তাদের প্রতি চেয়ে থাকেন। অনেকে অনেক মুক্তা আহরণ করেন। তবে তাঁদের প্রথম মুক্তার মতো কোনটি এতো জ্যোতিষ্ময় নয়। তাঁরা আনন্দ চিত্তে আল্লাহ্র প্রতি শোকরিয়া আদায় পূর্বক বাড়ি ফিরে আসেন। স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহঃ) উৎফুল্ল চিত্তে বলে ওঠেন 'মোবারক'। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি পরম সৌভাগ্যবতী। দয়াময় আল্লাহ্ আপনার ও আমার স্বপ্ন সফল করুন। আপনার গর্ভে মহান আল্লাহ্ এক অত্যোজ্জ্বল মুক্তা রূপী সন্তান দান করবেন–যাঁর সুকীর্তিতে বিশ্ব ভ্রমাণ্ড মুখরিত হবে। তাঁর আলোতে সারা ভূবন আলোকিত হয়ে যাবে। এটি আল্লাহ্র অশেষ কৃপা।

হযরত গাউসুল আযম শাহ্সুফি সৈযদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম হলেন নূর নবী, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর আদরের দুলালী হযরত সৈয়দা ফাতেমাতুজ যাহরা (রাঃ) এবং মওলা আলী মুশ্কিল কোশার (রাঃ) পুণ্যবান সন্তান হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এবং ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর অধস্তন আওলাদবৃন্দের ধারা; যাঁরা ধীরে ধীরে আরব-ইয়েমেন-পারস্য-বাগদাদে বসতির মাধ্যমে জিলান শহরে এসে পবিত্র শোণিত ধারয় মিলিত হন। এ পবিত্র মিলনের শুভ পয়গাম হচ্ছেন গাউসুল আযম শায়খ মুহীউদ্দিন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (কঃ)। উল্লেখ করা সঙ্গত যে, তাঁর পিতৃকুল হাসানী এবং মাতৃকুল হোসাইনী ছিলেন। এ পবিত্র শোণিতের শক্তিশালী ধারা ধর্মীয় নেতৃত্ব নিয়ে মানব হেদায়তের পথ প্রদর্শন মানসে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। হেদায়ত কর্ম এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারে তাঁদের সৈয়দী মিরাছের সাফল্য ছিল অতুলনীয়। তাই হেদায়ত কর্ম, কাজী পদে নিয়োগ এবং ইমামতীর জন্যে দিল্লীর সম্রাট-সুলতানরা তাঁদেরকে আমন্ত্রিত করে বিভিন্ন হেদায়তী পদে নিযুক্ত করেন। তাদের কেউ কেউ তদানীন্তন বাংলার স্বাধীন সুলতানের আমন্ত্রণে ইমাম এবং কাজী পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বাংলার রাজধানী গৌড় নগরে আসেন। তাঁদেরই একজন হলেন সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী। তিনি ছিলেন গৌড় নগরের কাজী। এক সময় গৌড় নগরী মহামারীর কারণে জনশূন্য হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে গৌড় নগরীর কাজী সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ী ১৫৭৫ খৃস্টাব্দে হেদায়তের মিশন নিয়ে চট্টগ্রামে চলে আসেন। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার কাঞ্চন নগরে বসতি স্থাপন করেন এবং ইসলাম ধর্মের মূলবাণী তাওহীদ প্রচারে মনোনিবেশ করেন। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে পটিয়ার হামিদগাঁও গ্রামটি তাঁর নামেই গড়ে উঠেছে। সৈয়দ হামিদ উদ্দিন গৌড়ীর একপুত্র সন্তান সৈয়দ আবদুল কাদের (রহঃ) ইমামতির উদ্দেশ্যে ফটিকছড়ির আজিম নগর গ্রামে আগমন করেন। তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আজিম নগরে এখনো ঐতিহ্যবাহী এ পরিবারের বংশধর বিদ্যমান আছে। আছে অনেক স্মৃতি চিহ্ন। সৈয়দ আবদুল কাদের (রহঃ) এর একপুত্রের নাম সৈয়দ আতা উল্লাহ্ এবং তৎপুত্র সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ্ আজিম নগরে ইমামতি এবং দ্বীনি শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত থাকেন। সৈয়দ তৈয়ব উল্লাহ্র তিন পুত্র সন্তানের মধ্যে মধ্যম পুত্র হলেন সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহঃ)। তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার মোত্তাকী আলেম হিসেবে সর্ব সাধারণের নিকট শ্রদ্ধাভাজন ও বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তিনি আজিম নগর থেকে হিজরত করে মাইজভাণ্ডার গ্রামে বসতি স্থাপন করেন এবং মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্ববিখ্যাত অলি হযরত গাউসুল আযম শাহ্সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম।

হযরত গাউসুল আযম শাহ্সুফি সৈযদ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের পিতা হলেন সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহঃ) এবং গর্ভধারিনী মাতা হলেন সৈয়দা বিবি খায়রুন্নেসা। তাঁর শুভ জন্ম তারিখ হচ্ছে ১২৪৪ হিজরী, ১লা মাঘ ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ খৃস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি (বর্তমান দিন পঞ্জিকা অনুযায়ী ১৪ জানুয়ারি) ১১৮৮ মঘী সন। দিনটি ছিল বুধবার, জোহরের সময়। অর্থাৎ শীতকালীন সূর্য তখন করোজ্জ্বল এবং

উদ্দীপ্ত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দা বিবি খায়রুন্নেসা লক্ষ্য করলেন, যেন পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর হেসে হেসে তাঁর গৃহে প্রবেশ করছেন। সে এক মনমোহিনী অলৌকিকতা।

শিশু গাউস ভূমিষ্ঠ হবার তিনদিন গত হলে পিতা-মাতা সপ্তম দিবসে নাম রাখার সিদ্ধান্ত নেন। আয়োজন চলাকালে সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহঃ) রাত্রিকালে গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নের মাধ্যমে শিশুর নামকরণের জন্য আদিষ্ট হলেন। স্বপ্নে তিনি দেখলেন, মহানবী (দঃ) তাঁকে বলছেন, "হে মতিউল্লাহ্! তোমার ঘরে আমার প্রিয় মাহবুব আহমদ উল্লাহ্ এসেছেন।" সৈয়দ মতিউল্লাহ্ প্রথমে মহানবীর (দঃ) বাণী শুনে স্তম্ভিত হলেন। বাণীটি তাঁর বোধগম্য হয়নি। নবীবর (দঃ) তাঁকে পুনর্বার বললেন, "তোমার গৃহে আমার মাহবুব বিকাশ লাভ করেছে। আমি তাঁর নাম আমার "আহমদ" নামের সাথে আল্লাহ্ যুক্ত করে আহমদ উল্লাহ্ রাখলাম। সপ্তম দিবসে সুন্নতি আদলে নাম রাখার এন্তেজাম শুরু হয়। আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী নাম প্রস্তাব শুরু করেন। সবশেষে পিতা সৈয়দ মতিউল্লাহ্'র উপর নাম প্রস্তাবের পালা আসে। তিনি কোন প্রকার রাখ ঢাক না করে প্রকাশ্যে বললেন, "আমি তাঁর নাম 'আহমদ উল্লাহ্' রাখতে স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছি। সুতরাং, তাঁর নাম আহমদ উল্লাহ্ রাখাই বাঞ্ছনীয়।" নামকরণ বিষয়ে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে শায়খুল আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (কঃ) খাতেমুল অলদের বিষয়ে এধরনের অর্থবোধক নামেরই পূর্বাভাস তাঁর 'ফসুসুল হেকম' গ্রন্থে প্রদান করেছেন। একই ধরনের পূর্বাভাস মোতালেবে রশীদী কিতাবে মওলানা তোরাব আলী কলন্দরও উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, "ইছমুল্লাহ্ ফরদুল আফরাদের বিশ্বাসের আল্লাহ্ শব্দ বিশিষ্ট হবে।" এ নামের সঙ্গে 'আহমদ' এর মিমের পর্দা এবং জাতি নাম 'আল্লাহ্' অত্যন্ত রহস্যময় ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ অর্থবোধক বিষয়।

তাঁর পবিত্র নামের আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দ 'হামদুন' ধাতু হতে উৎপন্ন। শব্দটি একবচনে অর্থবোধক। এ শব্দের মাধ্যমে উত্তম পুরুষ এবং বর্তমান ভবিষ্যত উভয়কালকে বোধ করে। যেমন 'আল্ হামদু'-আমি প্রশংসা করছি এবং অবিরত করতে থাকব। এটি পবিত্র কুরআনের প্রথম শব্দমালা। তাহলে 'আহমদ উল্লাহ্' শব্দের বিন্যাস দাঁড়ায় আহমদ+আল্লাহ্-অর্থাৎ আমি আল্লাহ্তালার প্রশংসা করছি এবং করব। এটি শুধু শব্দ সমষ্টি নয় বরং ভাব প্রকাশ সমৃদ্ধ পূর্ণবাক্য। ব্যাকরণগত বিন্যাসের আলোকে স্পষ্ট করা যায় যে, আহমদ উল্লাহ্ এবং আলহামদু লিল্লাহ্ একই অর্থ এবং ভাববোধক বাক্য হিসেবে পরিগণিত। অর্থাৎ আমি মহা বিশ্বের একমাত্র 'রবের' প্রশংসা করছি। সুতরাং, আহমদ উল্লাহ্ নামের অর্থ দাঁড়ায়-'আল্লাহ্র প্রশংসাকারী'। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের নামের তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য নিম্নের বর্ণনাটি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) মহানবীর (দঃ) পিতার নাম 'আবদুল্লাহ্' এর প্রশংসা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, 'নিঃসন্দেহে এটা নবী করিম (দঃ) এর পিতার নাম। এটা ঐ নাম যা আল্লাহ্ তা'লার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।"

মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে "ঐ দুটি নাম আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয়, একটি আবদুল্লাহ্ এবং দ্বিতীয়টি আবদুর রহমান।" আল্লাহ্ শব্দটি ইসমে আযম। আরো উল্লেখ আছে সমস্ত সুন্দর নাম ইসমে আযম আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর অধীন। আল্লাহ্ নামের পর রহমান নামের মর্যাদা অনুভূত হয়, আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা করেন, "(হে নবী) আপনি বলে দিন, তাঁকে আল্লাহ্ নামে ডাকো অথবা রহমান নামে ডাকো" (সূরা বনি ইসরাইল: ১৭: আয়াতাংশ ১১০)। আল্লাহ্র ঘোষণা মোতাবেক আল্লাহ্র কাছে এ দুটি নাম সবচেয়ে প্রিয়। প্রথমটি আবদুল্লাহ্ যা ইসমে আযমের সঙ্গে যুক্ত এবং দ্বিতীয়টি আবদুর রহমান যা রহমান নামের সঙ্গে সম্পর্কিত ও যার মর্যাদা ইসমে আযমের পরেই। তফসীরকারকরা উল্লেখ করেন, আশ্চর্যের কিছু নেই যে, হযরত আবদুল্লাহ্র জন্মকালীন সময়ে খাজা আবদুল মোত্তালিবের অন্তরে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষভাবে জাগরুক করে দেয়া হয়েছিল যে, এ পূণ্যময় সন্তানটির এমন একটি নাম রাখো, যা আল্লাহ্র কাছে খুবই প্রিয়। যারকানী প্রথম খণ্ডে উল্লেখ আছে যে, আবদুল মুত্তালিবই প্রথম হেরা গুহায় নির্জন ইবাদতের যাত্রা করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্র পিতা আবদুল মুত্তালিবের নির্জন ইবাদতের সঙ্গে পুত্রের নাম আবদুল্লাহ্ নামকরণ মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরণাদ্বীপ্ততার ফসল।

'আবদুল্লাহ্' শব্দ বাক্যের সরলার্থ হচ্ছে আল্লাহ্র বান্দা। অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ্র বান্দা যিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র বন্দনায় ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন। আল্লাহ্র নিকট আল্লাহ্র বন্দনাকারীই সর্বাধিক প্রিয়। মহানবী (দঃ) এর বেলায়তী নাম 'আহমদ'-যার অর্থ প্রশংসাকারী। মহান আল্লাহ্র সৃষ্ট তত্ত্বে প্রেমধারায় প্রথম উৎপত্তি ঘটেছে নূরে মুহাম্মদী। এ নূর ঊর্ধ্বমুখী বিকাশ পথে আবার বিনত হয়ে স্রষ্টা পানে সিজদা অবনত হয়। এটি স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। এটি শূন্য থেকে সৃষ্টি করার কারণে স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পন

জনিত প্রশংসা রীতি। এ প্রশংসা রীতির নাম হচ্ছে 'আহমদ'। আহমদের হাকীকত হচ্ছেন মুহাম্মদ। স্বাভাবিকভাবে আহমদ উল্লাহ্ হচ্ছেন আল্লাহ্র প্রশংসাকারী। ভাবগতভাবে আবদুল্লাহ্ এবং আহমদ উল্লাহ্ একই অর্থবোধক শব্দবাক্য। অর্থাৎ প্রশংসাকারী ও বন্দনাকারী। আল্লাহ্র নিকট আরেকটি প্রিয় নাম আবদুর রহমান। এই নামটিও বন্দেগী নির্দেশক। অর্থাৎ অসীম পরম করুণাময়ের বন্দেগীতে আল্লাহ্ পরম সন্তুষ্ট। মাইজভাণ্ডার শরিফে গাউসুল আযম বিল বিরাসত খ্যাত হযরত শাহ্সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমানও আল্লাহ্র নিকট প্রিয় নাম আবদুর রহমানের একই অর্থবোধক শব্দ বাক্য।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের বাল্যাচরণ এবং শিক্ষাসূচিতে অদ্ভূত অলৌকিকতা সকলকে বিস্ময় বিহ্বল করেছিল। দুই বৎসর বয়সে কোন প্রকার তাগিদ ব্যতীত তিনি যথাসময়ে মাতৃদুগ্ধ পান করা থেকে বিরত থাকেন। চার বৎসর চার মাস বয়সে তিনি স্থানীয় মকতবে ভর্তি হন। ভর্তির দিন ব্যতীত অন্য কোন সময় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কোন ব্যক্তিকে মকতবে যেতে হয়নি। তিনি একাকী পুস্তক-পুস্তিকা নিয়ে যথাসময়ে মকতবে পৌঁছে যেতেন এবং একাকী বাড়ি ফিরতেন। তিনি ছিলেন প্রখর মেধা এবং অনুশীলন-অনুবীক্ষণ প্রবৃত্তির অধিকারী। পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি যেন তাঁর জন্যে নির্ধারিত ছিল। মকতবে তিনি আরবী, বাংলা, উর্দু, ফার্সি ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করতে শুরু করেন। মকতবের চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। উচ্চ শিক্ষার জন্যে তখন চট্টগ্রামসহ পূর্ব বাংলায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে পারিবারিক সিদ্ধান্তে আর্থিক টানা-পোড়েন সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে কলিকাতা গমন করেন এবং বিখ্যাত কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মেধাবী শিক্ষার্থী হওয়াস বিভিন্ন প্রকার সরকারী-বেসরকারী বৃত্তি লাভ তাঁর জন্যে সহজতর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কোন প্রকার লজিং বা জায়গীর থাকার প্রয়োজন হয়নি। এমনিতেই তিনি জায়গীর থেকে পড়াশুনা করা পছন্দ করতেন না। কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষা সময় আট বৎসর অতিবাহিত হয়। এ সময় তিনি সুফি নূর মোহাম্মদ সাহেবের বাসায় থাকতেন। প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী অর্জন এবং প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব অব্যাহত রেখেই তাঁর একাডেমিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। হিজরী ১২৬৯ সনে তিনি যশোহর জেলার বিচার বিভাগীয় পদে কাজী হিসেবে নিয়োজিত হয়ে আয়-উপার্জন কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন এবং এক বৎসর উক্ত পদে কর্মরত থেকে ইস্তফা দেন। তিনি করুণার আধার। অনেক সময় দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে গিয়ে তিনি নিজে মুষড়ে পড়তেন। এটি তাঁর প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত রহমানি সিফতের নমুনা। পড়ে তিনি মুন্সেফ পদে পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেন। তাঁর বিবেচনায় এ পদে হক্কুল ইবাদ আছে, নিষ্ঠুর কোন সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রয়োজন পড়েনা। মুন্সেফী পরীক্ষায় প্রস্তুতি গ্রহণকালে তিনি প্রয়োজনীয় হালাল উপার্জন মানসে কলিকাতা মুন্সি বো-আলী মাদ্রাসায় প্রধান মোদারেসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করেন। ইতোমধ্যে মুন্সেফ পরীক্ষায় অংশ নেন। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একশ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠায় এক পর্যায়ে সরকার সমস্ত পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেন। ফলে তিনি মাদ্রাসায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম সাত বৎসর বয়সে নিয়মিত নামায-রোযার মতো ফরজ ইবাদতে দাখিল হন। এ জন্যে তাঁকে কোনসময় তাগিদ দিতে হয়নি। পিতা শাহ্সুফি সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রঃ)-এর সঙ্গী হয়ে তিনি যথাসময়ে জামায়াত সহকারে নামাযে সামিল হতেন। শিশু বয়স থেকে ধর্ম, কর্ম, সততা, নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তার কারণে তিনি পাড়া-প্রতিবেশি-আত্মীয় স্বজনদের নজর কাড়েন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলম নিজের যৌবনের সূত্রপাতের বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, যৌবনের তাগিদ অনুভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যৌবন তরীর চালক হিসেবে তরীতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে তরী থেকে প্রবল শক্তিমান বীভৎস প্রকৃতির দুই জোয়ান পানিতে পড়ে যায় এবং হাবুডুবু খেতে খেতে অতলে তলিয়ে যায়। গাউসুল আযম শাহ্সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা আলমের যৌবন সম্পর্কে নিজস্ব সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে তাঁর সংযম এবং আত্ম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়। ফলে জীবন-যৌবনের শুরুতেই তিনি নিজকে নিষ্পাপ-পরিশুদ্ধ মানব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ ধরনের খোদাদাদ প্রকৃতিগত নির্মল নির্ভুল চারিত্রিক সৌন্দর্যের অধিকারী হযরত শাহ্সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা আলম মুন্সি বো-আলী মাদ্রাসায় শিক্ষকতাকালে সুমিষ্টভাষী, সদাচার ধীর স্থির ও বুদ্ধি বিবেচনা জনিত কর্মধারার কারণে তিনি ছাত্র-শিক্ষক-সহকর্মী সকলের প্রিয় এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হন। মুন্সি বো-আলী মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভের

কারণে তিনি কলিকাতার বিভিন্ন ওয়াজ এবং ধর্মীয় মাহফিলে ওয়ায়েজীন হিসেবে আমন্ত্রিত হতেন। এ ধরনের একটি ওয়াজে উপস্থিত হবার জন্যে পাল্‌কীযোগে যাবার কালে তিনি ঐশী প্রেমিক শিকারীর তীরবিদ্ধ হয়ে ত্বরিকতে অন্তর্ভুক্ত হন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জীবনী শরিফে বর্ণিত আছে, "একদা হযরত পাল্কীযোগে ওয়ায়েজ মাহফিলে যাইতেছিলেন। পথে এক দুরদর্শি তীক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন সাহেবে কশ্‌ফ অলির অন্তর্চক্ষুতে তিনি ধরা পড়িলেন। ইনি হইলেন সু-প্রসিদ্ধ বাগদাদবাসী হযরত দস্তগীর গাউসুল আযম মহিউদ্দীন সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) এর বংশধর ও উক্ত ত্বরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত সুলতানুল হিন্দ সরদারে আউলিয়া গাউসে কাওনাইন শেখ সৈয়দ আবু শাহমা মোহাম্মদ সালেহ আলকাদেরী লাহোরী। তাঁহারা তিন ভাই। তাঁহার বড় ভাই এর পবিত্র নাম হইল হাজীউল হারামাইন হযরত শাহ্ সৈয়দ দেলাওয়ার আলী পাকবাজ। তিনি খোদার ভাবে চিরকুমার ছিলেন। হযরত শাহ্ সৈয়দ দেলাওয়ার আলী অতি জজবাপূর্ণ কুতুবে জামান ছিলেন। তিনি সর্বদা খোদা প্রেম প্রেরণায় মত্ত অবস্থায় হুজরায় গোশানশীন থাকিতেন। সপ্তাহে শুক্রবার একদিন মাত্র তিনি হুজরার বাহিরে আসিতেন। তিনি কাহাকেও হাত ধরিয়া মুরীদ-তলকীন করিতেন না। কথিত আছে, তিনি যখন বাহিরে পদার্পণ করিতেন, তাঁহার চেহারা দর্শনে মানুষ কি পশুপক্ষী পর্যন্ত জজবাতী অবস্থায় অজদ ও প্রেরণায় প্রেম নৃত্য করিতে থাকিত। তাঁহার ছোট ভাইয়ের পবিত্র নাম ছিল হযরত শাহ্‌সুফি মোহাম্মদ মুনির। তিনিও সুপ্রসিদ্ধ পীরে কামেল ছিলেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ দিল্লী ও লাহোরে থাকিয়া হেদায়ত কার্য করিতেন। ক্রমান্বয়ে লাহোর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত তাঁহাদের হেদায়ত কার্য চলিতে থাকে। হেদায়ত উপলক্ষে তাঁহারা কলিকাতা নগরীতে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের শিষ্য ও ভক্ত অনেক। হযরত শাহ্‌সুফি সৈয়দ আবু শাহমা তাঁহার অর্জিত "লাল" অর্পণ করিবার জন্য উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে আছেন। একদা জোহর নামাযান্তে তিনি তারকাবেস্টিত পূর্ণচন্দ্রের মত তাঁহার ভক্ত মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার বালাখানায় বসিয়া ধর্মালোচনায় ব্যস্ত আছেন। তখন কে যেন আড়ালে থাকিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,- "হে জ্যোতির্ময়" "লালধারী" আবু শাহ্‌মা। তোমার বাঞ্ছিত মুরাদ, অতুলনীয় উপযোগী পাত্র, তোমার সম্মুখ দিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে অতিসত্বর সাদরে গ্রহণ কর।" দেখিতে দেখিতে হযরতের পাল্কী সোয়ারী তাঁহার বালাখানার সম্মুখস্থ বৈঠকখানার পার্শ্ববর্তী রাস্তার দ্বারদেশ অতিক্রম করিতেই শিকার যেন তীরবিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যেন পাল্কীর ফাঁকে হযরতের চন্দ্রাকৃতি অত্যুজ্জ্বল চেহারা দর্শনে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কে তিনি কৃতী সন্তান সোয়ারী। নিশ্চয় তিনি হাদীকুল বীর কেশরী। তোমরা কি কেহ তাহাকে চিন? সকলে সচকিত ও নীরব। কেবল মাত্র তাঁহার শিষ্য প্রবর শাহ্ এনায়েত উল্লাহ্ সাহেব উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ হুজুর চিনি।" তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বর্ণনা করিলেন। ইহাতে তিনি আরো অধিক আকৃষ্ট হইয়া গেলেন। শাহ্ এনায়েত উল্লাহ্ সাহেবকে তড়িৎ গতিতে তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ বাসনা জানাইতে আদেশ দিলেন। শিষ্য প্রবর হযরতের পাল্কীপাশে যাইয়া সংবাদ জানাইলেন। হযরত দ্বিধায় পড়িলেন। বহু লোক ওয়ায়েজ মাহফিলে তাঁহার জন্য এন্তেজারে রহিয়াছে। আয়োজিত মাহফিল- আবার একদিকে একজন মহান অলি আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের আহ্বান উপেক্ষা করা চলে না। নিশ্চয় ইহাতে কোন প্রকার খোদায়ী রহস্য নিহিত আছে। হযরত ক্ষণকাল চক্ষু মুদিয়া চুপ রহিলেন। তৎপর বলিলেন, "আচ্ছা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ। তাহাই হউক, চলুন।" সোয়ারী ফিরাইয়া দেওয়া হইল। পাল্কী হইতে তিনি অবতরণ করিলেন। উপস্থিত শিষ্যরা তাঁহাকে অতি আদর অভ্যর্থনায় তাহাদের পীর সাহেবের বৈঠকখানায় নিয়া গেলেন। হযরত খেদমতে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন জানাইতে হযরত শাহ্ সৈয়দ আবু শাহ্‌মা সাহেব তাঁহার গদী শরিফ হইতে দন্ডায়মান হইয়া সাদরে তাঁহার সহিত সুন্নতী করমর্দন ও বক্ষ মিলামিলি করিয়া তাহার পালঙ্কের উপর নিজ গদীতে পরম বন্ধুর মত পার্শ্বে বসিতে দিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রেম বিনিময় ও রহস্যপূর্ণ প্রেমালাপ আরম্ভ হইল। শিষ্যবৃন্দ এই অভিনব অপূর্ব দৃশ্য দর্শনে অবাকচিত্তে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। এই প্রেম অভিনয় ক্রীড়ায় লাহোরী সাহেবের প্রেম মঞ্চে বসিয়া গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী গোপনে লভিয়া লইলেন তাঁহারই অর্জিত গাউসিয়া "লাল"। নয়ন ঠারে আহরণ করিলেন তাঁহারই আহরিত সৌভাগ্য পরশমণি। তাহারই দস্তে বায়াত হইয়া প্রতিদানে প্রাপ্ত হইলেন গাউসিয়তের খোদা-দাদ খনি।

অতঃপর শাহ্‌সুফি হযরত আবু শাহ্‌মা তাঁহার অন্যতম খলিফা উক্ত এনায়েত উল্লাহ্ সাহেবকে আন্দরে বাবুর্চি খানায় পাঠাইয়া যাবতীয় তৈয়ারী খাসখানা হযরতের সামনে উপস্থিত করিতে নির্দেশ দিলেন। অনতিবিলম্বে উহা প্রতিপালিত হইল। এনায়েত উল্লাহ্ সাহেব পাত্রপূর্ণ সমস্ত খাসখানা খেদমতে

উপস্থিত করিলেন। হযরত আবু শাহমা সাহেব উহা কবুল করিতে হযরত সাহেবকে নির্দেশ দিলেন। হযরত নিজ বাসভবন হইতে যথারীতি পানাহার করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। তবুও তাঁহার পীর সাহেব প্রদত্ত ফয়েজ বরকতপূর্ণ তাবারোকী খানা গ্রহণে তিনি বিরত হইলেন না। বিসমিল্লাহ্ বলিয়া খানা গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে পাত্রপূর্ণ খানা নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার তৃপ্তি হইল না। যদিও পাত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ খানা ছিল তিনি আরো খানা চাহিলেন। হযরত আবু শাহ্মা সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হে প্রিয়তম! আমার বাবুর্চিখানায় আপনার জন্য যাহা সুরক্ষিত ছিল তাহা আনিত হইয়াছে। আরো অধিক প্রয়োজনে আপনি স্বহস্তে পাকাইয়া খাইবেন।"

সত্যই যেন তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কলবরূপী বাবুর্চি খানায় সারা জীবনের অর্জিত খোদায়ী নেয়ামত, যাহা মওজুদ ছিল সবই তাঁহাকে অর্পণ করা হইয়াছে। আরো প্রয়োজন হইলে, তাঁহাকে উহা নিজ প্রেম প্রেরণায় ইবাদত ও রিয়াজতের বদৌলতে অর্জন করিতে হইবে। এমনি করিয়া হযরত আকদাস অপ্রত্যাশিতভাবে পীরের প্রথম সাক্ষাতে তাঁর সঞ্চিত যাবতীয় নেয়ামত ও খোদাদাদ শক্তি লুটিয়া নিলেন এবং প্রথম দর্শনে তাঁহার সমগুণে রূপায়িত হইয়া প্রধান খলিফারূপে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুর আসন গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর গাউসে পাক সেই দিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর হযরত শাহ্সুফি আবু শাহ্মা বলিতে লাগিলেন, এইবার খোদা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। যাঁহার প্রতীক্ষায় ছিলাম তাঁহাকেই আল্লাহ্তা'লা মিলাইয়া দিলেন। সারাটা জীবনে সবেমাত্র একটি লোকের হাতেই হাত মিলাইলাম। আল্লাহ্ তাহাকে মহিমান্বিত করুন।"

হযরত বিদায় গ্রহণান্তে বাসায় ফিরিলেন বটে কিন্তু উভয়ের মধ্যে এমনি এক যোগসূত্র পাতিয়া রহিল যাহার কোন সীমা পরিসীমা নাই। আছে শুধু সুদূর প্রসারী দাহন। তাঁহারা একে অন্যের মিলন প্রয়াসী, দর্শন প্রত্যাশী। একে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কালচক্রে কোনদিন সাক্ষাৎ করিতে অপারগ হইলে হযরত আবু শাহ্মা বিচলিত হইয়া পড়িতেন এবং হযরত আকদাসের বাসায় আসিয়া পড়িতেন। এমনিভাবে দুই দেহ এক প্রাণ হইয়া হযরত আকদাস ফানাফিশ্শেখ মোকাম অতিসত্বর পূর্ণাকারে অতিক্রম করিয়া লইলেন। এমতাবস্থায় কিছুদিন যাওয়া আসা চলিতে লাগিল।

এহেন অবস্থায় তিনি পূর্ব বর্ণিত শাহ সাহেবের বড় ভাই কুতুবুল আকতাব হযরত শাহ্সুফি দেলাওয়ার আলী পাকবাজ সাহেবের খেদমতে গিয়া ফয়েজ গ্রহণে আদিষ্ট হইলেন। পীর সাহেবের এই আদেশে তিনি অতি আহলাদিত চিত্তে তাঁহার খেদমতে রওয়ানা হইলেন। এমনি সময়ে চিরকুমার আলহাজ্ব হযরত শাহ্ দেলাওয়ার আলী সাহেব আপন হুজরা শরিফ হইতে বাহিরে পদার্পণ করিলেন। হযরত আকদাস তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতেই তাঁহার শুভদৃষ্টি হযরতের প্রতি আকর্ষিত হইল। তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাঁহার পবিত্র আত্মার উপর ফয়েজে ইত্তেহাদীর প্রভাব বিস্তার করিলেন এবং তাঁহার অর্জিত সমস্ত খোদাদাদ শক্তি এবং বাতেনী নেয়ামত কুতুবিয়ত পরশমণি হযরত আকদাসকে সাদরে দান করিয়া দিলেন। এইভাবে হযরত দুইজন মহান পবিত্র মণিধর আউলিয়ার দুর্লভমণি আহরণ করিয়া নিলেন। না জানি কোন মোহিনী বলে কোন ঐশ্বরিক যাদুর আকর্ষণে প্রথম সাক্ষাতেই হযরত তাঁহাদের সর্বস্ব লুটিয়া নিতে পারিয়াছিলেন।"

মুহূর্তেই কামালিয়াত অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐশী প্রেম ধারায় প্রচণ্ড জজবাতি অবস্থা শুরু হয়। তাঁর পীরের "স্বহস্তে পাকাইয়া খাইবেন" পবিত্র বাণীকে আয়ত্ত করতে কঠোর রিয়াজত মোরাকাবা মোশাহেদায় দিন অতিবাহিত কালীন সময়ে তিনি আত্মভোলা হয়ে পড়েন। প্রেম প্রেরণাধিক্যের কারণে তিনি পানাহার ত্যাগ করেন। এক পর্যায়ে স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভেঙ্গে যায়। জীর্ণ শীর্ণ দেহে তিনি নিতান্ত দুর্বল অবস্থায় আল্লাহ্ তালাশির বিমারে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। আল্লাহ্ প্রেমের অগ্নিশিখার উন্মত্ত দাহন থেকে মুক্তির কোন চিকিৎসা ডাক্তারের নিকট নেই। এ অনন্ত বিমারের স্থায়ী চিকিৎসা হচ্ছে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলন। এ ধরনের অবস্থায় নিকট আত্মীয় স্বজন থেকে দূরে তিনি তাঁর দুই বন্ধু সুলতানপুরী মৌলভী জান আলী সাহেব এবং মৌলভী আবদুল বদি আসকারাবাদীর সেবা যত্নে পরিচার্যিত হন। তাঁর শারীরিক অবস্থা এবং পরম নিস্তব্ধতা অবলোকনে সর্বদা লোক সমাগম হতে থাকে। তাঁর দৈহিক অবস্থার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করে বন্ধুদ্বয় ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠেন। ইতোমধ্যে ১২৭৫ হিজরীর ২৯ আষাঢ় সোমবার তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত শাহ্সুফি সৈয়দ মতিউল্লাহ্ (রহঃ) ওফাত ফরমান। পরিবারে এমন বিষাদের ছায়া চলাকালে কলিকাতা থেকে হযরত শাহ্সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ কেবলা আলমের পক্ষ থেকে বন্ধুদের লিখা চিঠি মাইজভাণ্ডার শরিফে পরিবারের হস্তগত হয়। পুত্রের সঙ্গীন অবস্থার খবরে বিপদে অন্তলীন মাতা

আকুল হয়ে ওঠেন। সকলের পরামর্শক্রমে মধ্যম ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল হামিদ কলিকাতায় এসে হযরত কেবলা আলমের পীরের নির্দেশক্রমে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

মাইজভাণ্ডার গ্রামে স্বীয় পারিবারিক পরিমণ্ডলে সেবা যত্নের মাধ্যমে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ অবস্থায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে ওঠেন। এ যেন ফানাফিল্লাহ্ থেকে তাঁর বাকাবিল্লায় স্থিতি অর্জন। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ঘটনাক্রমে তাঁর ফুতুহাত প্রকাশ পেতে থাকে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত প্রত্যাশীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়তে থাকে। ফরিয়াদী, হাজতী, মক্সুদীর পাশাপাশি আল্লাহ্ তালাশে উদ্গ্রীব চিত্ত চঞ্চল আশেকের আগমনে মাইজভাণ্ডার গ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে রূপ নিতে থাকে। ইতোমধ্যে অসংখ্য কামেলীনের সমাগমে সমৃদ্ধ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফকে তাঁর 'ফুল বাগান' আখ্যায়িত করে নিজস্ব ত্বরিকা অনুযায়ী সাধনা-রিয়াজতের পদ্ধতি চালু করেন। বিভিন্ন ত্বরিকা এবং ধর্ম মতের সূক্ষ্ম সমাবেশকারী হিসেবে তিনি যুগ চাহিদা অনুযায়ী রূপক কালাম এবং খিজরী কার্যাবলীর মাধ্যমে ত্বরিকতপন্থা প্রচলন করেন। তাঁর কার্যাবলী এবং গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত কালামের ভিত্তিতে প্রচারিত হতে থাকে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের সম্মুখে প্রতিদিন আগত অসংখ্য দর্শনার্থীর প্রায় সকলেই অলৌকিক আচরণের মুখোমুখি হয়েছেন। অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী ধনী, গরীব, ফকির, মিসকিন নির্বিশেষে সকলকে অনায়াসে দর্শন দানে কৃপা করতেন। তাঁর পবিত্র নাম স্মরণ করা মাত্রই তিনি অনুগ্রহের ছায়া বিস্তার করে সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করেছেন। তাঁর কারামতসমূহ গাউসুল আযম দস্তগীর সাহেব কেবলার সঙ্গে বহুলাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হেদায়তের আলো নির্দেশক। আধ্যাত্মিক ক্ষমতা এবং ঐশী প্রেম সরবত বিতরণের মাধ্যমে প্রেমনেশা সৃষ্টি বিষয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়াবান। মহামূল্যবান এই ঐশী অনন্ত সম্পদের জন্য যাঁরাই তাঁর পবিত্র কদমের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি তাঁদেরকে তাঁর খলিফার মর্যাদায় অভিষিক্ত করে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, সৌভ্রাতৃত্ব, সহাবস্থান এবং সদাচারের পথে দাওয়াত পৌছানোর লক্ষ্যে ঐশী প্রেম নিনাদের পাঠশালা খুলে দিয়েছেন। তাঁর নিকট থেকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত আউলিয়াগণের প্রতিটি 'বাসগৃহ' এক একটি 'দরবার শরিফে' পরিণত হয়। এ সকল দরবার থেকে নিয়মিতভাবে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রচার ও প্রসার কাজ চলছে। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের পবিত্র জবানে এগুলোর সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর ফুল বাগান। (চলবে) ❑

সুফি উদ্ধৃতি

- আউলিয়াদের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কঠিন কোন কাজ নেই।
- স্বাদে তৃপ্তি আর চেষ্টায় বিশ্বাস এ দু'টোকে ত্যাগ করতে পারলেই দাসত্বের হক আদায় হয়।
- নিজেকে নিয়ামতের অনুপযুক্ত বলে ধারণা করাই শোকর বা কৃতজ্ঞতা।
- যে স্থানে মিথ্যা না বললে রক্ষা পাওয়া মুশকিল সে স্থানেও মিথ্যা না বলা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা।
- প্রকৃত ফকীরের লক্ষণ হল সে কারও কাছে কিছু চায় না, কারও সাথে ঝগড়া করে না, কেউ ঝগড়া করতে চাইলেও চুপ করে থাকে।
- ধৈর্য্য মানুষকে বিনা প্রার্থনায় ও বিনা মিনতিতে আল্লাহ্র সাথে লিপ্ত রাখে।
- রুজী-রোজগার উপার্জন না করার নামও তাওয়াক্কুল।
- দোজাহানের কারও চেয়ে নিজেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মনে না করা, আর একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষী না হওয়াই হল নম্রতা বা বিনয়।

–হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোত্‌লাকার উৎস সন্ধানে

• জাবেদ বিন আলম •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাসাওউফ প্রসঙ্গ

তাসাওউফ হচ্ছে স্বীয় সত্তাকে সত্যের উপর বিলীন করে দেয়া। এর মধ্যে কোন প্রকার অপবিত্রতা ও সংকীর্ণতা থাকে না। তাসাওউফের ভিত্তি হলো দ্বীন। দ্বীনের মূল বিষয় হলো আন্তরিকতা ও মহব্বতের সঙ্গে আহকামে ইলাহীর অনুসরণ করা। অর্থাৎ ইলাহীর সঙ্গে প্রেম নিসবত স্থাপন করা। কুপ্রবৃত্তি, লোভ লালসা, পার্থিব লৌকিকতা মুক্ত হয়ে সাহসিকতার সঙ্গে সকল প্রকার অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করে নিজেকে 'মুক্ত মানব' হিসেবে হাজির করা হচ্ছে তাসাওউফের মৌলিক শিক্ষা। তাসাওউফ যেহেতু স্রষ্টা প্রেম নির্ভর আরাধনা সেহেতু তাসাওউফের অভিযাত্রায় মৌলিক সম্বল হচ্ছে প্রেম বা ইশ্‌ক অর্জন করা। তাসাওউফ ধারায় প্রেমের মহিমান্বিত অনন্য উদাহরণ হচ্ছেন হযরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ)। নবী করীম (দঃ) এর পৃথিবীতে অবস্থানকালে তাঁর সাথে হযরত ওয়ায়েস করণীর (রহঃ) কখনো সাক্ষাত হয়নি। এর একটি প্রধান কারণ ছিল তাঁর বয়োবৃদ্ধা মাতা শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল ছিলেন। তিনি বয়োবৃদ্ধা মাতাকে একা রেখে ইয়েমেনের করণ এলাকা থেকে মদীনা মনোয়ারায় হাজির হয়ে নবী বরের (দঃ) সঙ্গে সাক্ষাতে যেতে পারেন নি। হযরত ওয়ায়েস করণীর এ অবস্থান অনুধাবনের জন্যে সূরা লোকমান এ বর্ণিত নির্দেশনা তাসাওউফ পন্থীদের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সবক। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে মহানবীকে (দঃ) না দেখেই তাঁর প্রতি এতো গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা বিদ্যমান ছিল যে, যখন তিনি জানতে পারেন যে, ওহুদ যুদ্ধে মহানবীর একটি দাঁত শহীদ হয়েছে তখন হযরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ) একটি একটি করে নিজের সবগুলো দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। কেননা তিনি চাক্ষুষভাবে দেখেননি যে মহানবীর (দঃ) কোন দাঁতটি শহীদ হয়েছে। প্রেম তথা ইশ্‌কের চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হবার কারণে হযরত ওয়ায়েস করণীর (রহঃ) মধ্যে এ ধরনের কোরবানী স্পৃহার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এতো বেশী ভীত ছিলেন যে, হুজুরের (দঃ) সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হয়তো প্রেমাধিক্যের কারণে তিনি ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবেন না। তাসাওউফ জগতে প্রেমের এ ধরনের অনন্ত অভিপ্রায় এবং প্রেরণা প্রবণতার নাম 'বেলায়ত'। সুলতানুল হিন্দ, গরীবে নেওয়াজ, আতায়ে রাসূল (দঃ) হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তির (কঃ) মতে বেলায়ত হচ্ছে 'দোজাহানে তোমার মিলনের দৌলতই যথেষ্ট', 'ইশ্‌কের দহন আর বন্ধুর তপ্ত দাগে প্রতিপালিত হৃদয়', 'আমরা তাঁর চিন্তায় বেহেশত, হূর ও গেলমান থেকে দূরে রয়েছি' আমার অস্তিত্ব আয়না হয়ে তোমার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে-আল্লাহ্‌র বান্দার এ ধরনের অবস্থানে উন্নীত হবার বিভিন্ন স্তর বা মোকামকে বলা হয় বেলায়ত। বেলায়ত 'অলা' শব্দ হতে উৎপন্ন। 'অলা' অর্থ নৈকট্য লাভ। এটি মহান আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রিয় বান্দার প্রেম-মহব্বত জনিত বিষয়কে নির্দেশ করে। বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে দুই প্রকার বেলায়ত বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমটি বেলায়তে ঈমান, অন্যটি বেলায়তে ইহসান। বেলায়তে ঈমান সকল মুমিন বান্দা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ঈমান বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌পাক ঘোষণা করেন, "হে ঈমানদারগণ! আন্তরিকভাবে তোমরা ঈমান গ্রহণ বা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং ঐ কিতাবের উপর যা আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন (সূরা আল ইমরান : ১৬৬)। ঈমান সম্পর্কে মহানবী (দঃ) উল্লেখ করেন, "ঈমান হলো এ যে, তুমি আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফিরিশতার উপর, তাঁর কিতাবের উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।" মহানবী (দঃ) আরো ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি এর অনুগত না হয় যা আমি নিয়ে এসেছি।" ঈমানের আভিধানিক অর্থ কোন বিষয়কে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করা এবং এ সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় রাখা। আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং নৈকট্য লাভ করার জন্য ঈমানই মূল ভিত্তি। ঈমানের কার্যকর বিষয় অনুধাবন করার জন্য পবিত্র কুরআনের ঘোষণার মর্মার্থ উপলব্ধি করা জরুরী। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, "বাদশাহ্‌ যখন কোন গ্রামে প্রবেশ করেন তখন সেখানে পূর্বের সবকিছু বিধ্বস্ত করে ফেলেন"-(সূরা আন নমল : ৩৪)। অর্থাৎ ঈমান রূপী বাদশাহ্‌ যখন কোন অন্তরে প্রবেশ করে তখন ব্যক্তির মন- দেহ সবকিছুই পরিবর্তন করে দেয়। সুতরাং বেলায়তে ঈমান অর্জনেই রয়েছে অত্যন্ত কঠিন শর্ত। অথচ এটি বেলায়তের একেবারে প্রাথমিক স্তর।

বেলায়ত সম্পর্কে অবহিত হতে হলে ইল্‌ম হাসিল বিষয়ের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন হয়। ইসলাম ধর্মের মর্মানুসারে ইলম অর্জনে তিনটি প্রক্রিয়া রয়েছে। প্রথম স্তর ইলমুল ইয়াকীন। এর অর্থ হচ্ছে মানুষের জ্ঞানলব্ধ প্রমাণাদি দ্বারা বিশ্বজগতের রহস্য অবগত হওয়া। এটি আলিমদের জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে অর্জিত স্তর। এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে হাক্কুল ইয়াকীন। এর অর্থ হলো বিশ্বজগত এবং স্বয়ং মানুষের নফসের হাকীকতের যে নিদর্শন বিদ্যমান আছে, এর মুশাহিদা দ্বারা হাকীকত সম্পর্কে ইয়াকীন (বিশ্বাস) এতো দৃঢ় হয় যে, এটা সত্য হবার ব্যাপারে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকতে পারেনা। এর ফলে মানব অন্তর সর্বোতভাবে বিশাল আকার ধারণ করে। এ ধরনের বিশ্বাস দৃঢ় হলেই মানব জীবনের প্রতিটি ধ্যান ধারণায় তা মূর্ত হয়ে ওঠে। ইল্‌মের জগতে এটি আল্লাহ্‌র অলিদের স্তর। জ্ঞানার্জনের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আইনুল ইয়াকীন। আইনুল ইয়াকীনের অর্থ হলো এমন বিশ্বাস এটি যেন প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশ্বাস। এটি আরিফদের (খোদা প্রেমিক) স্তর। অর্থাৎ হাকীকত সম্পর্কে মানুষের মনে এমন দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, যদি হাকীকতের পর্দা উন্মোচন করা হয়, তবে আরিফের ইয়াকীনে কোন প্রকার তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। এ স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নবীগণ নবুয়ত প্রাপ্ত হন না। এ স্তরে উপনীত হয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পরবর্তী ফলাফলের চিন্তা না করে ঘোষণা করেন, "অতপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমান রূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, এটি আমার প্রতিপালক, এটি সর্ববৃহৎ। যখন এটি অস্তমিত হল, তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরিক করো তার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই"-(সূরা আন আম: ৭৮-৭৯)। হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক এ অর্জন তাঁকে পর্যায়ক্রমে তাওহীদের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রত্যক্ষদর্শীর অবস্থানে উন্নীত করে। মানব হেদায়তের পথ প্রর্দশনের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী নবুয়তের পরিসমাপ্তি ঘটে মহানবী (দঃ) এর আগমনের পর। তাঁর পরে পৃথিবীতে কোন নবী আসবেন না। পৃথিবীর বুকে ওহী নিয়ে ফিরিশতাদের আগমনও আর ঘটবেনা। এ ধরনের অবস্থানের কারণে হেদায়তের পথ প্রদর্শকের আর কী প্রয়োজন নেই? অথচ পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী দেখা যায় মানবজাতিকে সহজ, সরল, সত্য পথ প্রদর্শনের জন্যে হেদায়ত কর্ম মূহর্তের জন্যেও বন্ধ থাকবে না। নবুয়তের পর এ দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌ রাহমানুর রহিম তাঁর প্রিয় বান্দা অলিদের উপর অর্পণ করেছেন। আল্লাহ্‌র অলিরা প্রধানত বেলায়তের চাদরে অবস্থান করে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ ধরনের বেলায়ত হচ্ছে বেলায়তে ইহসান। বেলায়তে ইহসান প্রত্যেক নবী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। অলিগণ নবীর পর্যায়ভুক্ত নন। তবে নবুয়তের বিকাশ ধারায় অলিগণ বেলায়তের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। বেলায়ত আখেরী মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বলবত থাকবে। নবুয়তের পর বেলায়ত হচ্ছে মানব হেদায়ত প্রাপ্তির আলোকবর্তিকা তথা সিরাজুম মুনিরা।

বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে বেলায়ত অর্জন প্রণালী ভেদে চার প্রকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: (১) **বিল আসালত** অর্থাৎ এটি মূলগত বা প্রকৃতিগত। সুফি পরিভাষায় এটিকে মাদারজাত বা জন্মগত বলা হয়। এ ধরনের বেলায়ত বিনা পরিশ্রমে আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণী হিসেবে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি যথাসময়ে প্রাপ্ত হন। গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের বেলায়ত প্রাপ্তির ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এ ধরনের অলি প্রধানত সুলতানুল অলি হিসেবে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা এবং হুকুম-আহকামের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অন্যান্য সকল অলি তাঁর নির্দেশিকাকে অনুসরণ করেন। (২) **বিল বিরাসত** এটি রূহানী উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত বিষয়। অর্থাৎ রূহানী স্থলাভিষিক্ত মর্যাদা প্রাপ্ত অলিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (৩) **বিদদারাছত জাহেরী ইলম** এবং বাতেনী শিক্ষা দীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। এ প্রক্রিয়ায় মানব যখন ইলমে লদুন্নী (গোপন জ্ঞান ও তথ্য) প্রাপ্ত হন তখন তা বিদ্‌দারাছত হিসেবে ব্যক্ত হয়ে থাকে। যেমন, সূরা কাহাফে বর্ণিত হযরত মুসা (আঃ) কর্তৃক হযরত খিযিরের (আঃ) নিকট থেকে হাসিলকৃত জ্ঞান। হযরত মুসা (আঃ) হযরত খিযির থেকে প্রত্যক্ষ ঘটনাপঞ্জী দৃশ্যমান হয়ে রহস্যময় এ জ্ঞানের সন্ধান প্রাপ্ত হন। (৪) **বেলায়ত বিল মালামাত** নফ্‌স বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে যে বেলায়ত অর্জন হয় সুফিরা তাকে মোখালেফাতে নফ্‌স বলেন। মানুষের অন্তরে বিদ্যমান নফ্‌সের ইচ্ছানুযায়ী কোন কাজ বা ভোগ উপভোগ থেকে বিরত থেকে, নফ্‌স বা প্রবৃত্তিকে কষ্ট দিয়ে আত্মার বশীভূত করে খোদায়ী শক্তি হাসিল করা হলো বিল মালামাত। এ ত্বরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত আবু ছালেহ হামদুন কাচ্ছার (রহঃ)। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রসিদ্ধ ফকিহ্‌ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। হযরত আবু তোরাব বলখী (রহঃ) তাঁর মারিফাতের মুর্শিদ ছিলেন। প্রখ্যাত আউলিয়া হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মুবারক (রহঃ) তাঁর খ্যাতনামা

মুরিদ ছিলেন। তাঁর ভক্ত এবং শিষ্য মণ্ডলী কাচ্ছারী নামে পরিচিত। তাঁর কৃচ্ছ্রতা সাধন, প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম এবং নফ্সের চরম বিরোধিতার বিষয়গুলো সাধারণের বোধগম্য ছিল না। তাঁর নফ্স বা প্রবৃত্তি বিরোধী আচার এবং কার্যাবলীকে ত্বরিকত নীতি সম্পর্কে অবুঝ ব্যক্তিরা মালামত বা অসদাচার হিসেবে বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গ করতো। সমালোচকদের বিদ্রূপ বাক্যই পরবর্তী সময় মালামতী ত্বরিকা হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। নিশাপুরে এ ত্বরিকা খুবই জনপ্রিয়তা পায় এবং খোদা প্রেমিকদের নিকট অতুলনীয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। হযরত হামদুন কাচ্ছার (রহঃ) এর মুরিদ এবং অনুসারীগণ 'মালামত' এবং 'কাচ্ছারী'-দুনামেই পরিচিতি লাভ করে। আরবী ভাষার কাচ্ছার অর্থ ধোপা। কাচ্ছারের কাজ কাপড় কেচে পরিষ্কার করা। কাচ্ছারী ত্বরিকার অনুসারীরা পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের আলোকে নিজেদের অন্তর এবং চরিত্রকে ধোপার কাপড় পরিস্কার করার মতো নিজেদের অন্তর এবং দেহকে পিটিয়ে ফাটিয়ে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার করে। মালামতী ত্বরিকার প্রতিষ্ঠাতা হযরত হামদুন কাচ্ছারের (রহঃ) পরহেজগারীর দৃষ্টান্ত ছিল বিস্ময়কর। একদা এক রাতে তিনি এক মুমূর্ষ বন্ধুর পাশে বসে তাঁর সেবা-শুশ্রুসা করছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর বন্ধু ইন্তিকাল করেন। বন্ধুর প্রাণ বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশে থাকা জলন্ত প্রদীপটি নিভিয়ে দেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অবাক হয়ে এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "এতোক্ষণ পর্যন্ত এ গৃহের যাবতীয় সম্পত্তির মালিক ছিলেন আমার বন্ধু। তাঁর ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়েছে তাঁর অনাথ পুত্র কন্যাগণ। এমতাবস্থায় ইয়াতিম পুত্র-কন্যাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের তেল দ্বারা বাতি জ্বালানো আমার পক্ষে কোনভাবেই জায়েয হতে পারে না।" তিনি বলেছেন, পূর্ববর্তী অলি-দরবেশদের নসীহত বেশি ফলদায়ক হতো। কারণ তাঁরা ইসলাম ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি, নিজেদের হক আদায় এবং আল্লাহ্ তালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কথা বলতেন। পক্ষান্তরে আমরা নিজেদের গৌরব ও সম্মান বৃদ্ধি, পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধি এবং মানুষের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করি। তাঁর মতে "যে বিষয় সমূহ অতি গোপনীয় বলে মনে হবে, তা কারো কাছেই প্রকাশ না করা চাই।" "কোন শরাবী মাতালকে দেখে ঘৃণা ও তিরষ্কার করা উচিত নয়, কেননা তাতে কোন স্বার্থ তোমারও নেই, তারও নেই।" তাঁর মতে "যে গরিব অহংকার করে সে ধনী অহংকারী অপেক্ষা কম মারাত্মক নয়।" নফ্স সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন, "যে নফ্সকে প্রিয় মনে করে সে নফ্সের দ্বারা ফিরাউনী কাজ করে। অর্থাৎ মারাত্মক অন্যায় কাজ করে ফেলে এবং তার অশুভ পরিণাম ভোগ করে।" তাওয়াক্কুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে হযরত হামদুন কাচ্ছার (রহঃ) উল্লেখ করেন, "যদি কারো খুবই বড় ঋণও থাকে, যা আদায় করার কোন সম্ভাবনা নেই তেমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্র উপর তা আদায় করার পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস রাখাই হলো পূর্ণ তাওয়াক্কুল।" হযরত হামদুন কাচ্ছার (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত মালামিয়া ত্বরিকা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য ত্বরিকা। জিয়াউল কুলুব কিতাবে অলিয়ে কামেল, মুজাহিদে মিল্লাত হযরত শাহ্সুফি হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজেরে মক্কী (কঃ) মালামিয়া ত্বরিকাকে সাত্তারিয়া ত্বরিকা নামে অভিহিত করেছেন। হযরত মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) উল্লেখ করেন, "এ ত্বরিকা পন্থীরা সকল জাগতিক আবিলতা হতে নিজেদের সম্পর্কছেদ করে মানুষের সংসর্গ হতে আলাদা হয়ে থাকেন। প্রেমাস্পদের তীব্র মিলন আগ্রহ এবং যিকর ও শোকর, স্মরণ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ভিন্ন এদের লক্ষ্য পথে আর কিছুই থাকে না। তাঁদের দৃষ্টিতে কাশ্ফ ও কারামত তেমন কোন গুরুত্ব রাখেনা। 'মৃত্যুর পূর্বে মরে যাবার, অনুশীলনে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁরা সময় ব্যয় করেন। এ ত্বরিকায় অন্য ত্বরিকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সঙ্গে মূল উদ্দেশ্য সফল হয়। এ ত্বরিকায় সাফল্য অর্জনের জন্য দশটি উপায় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ তাওবা। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকোন মতলুব ও মকসুদ যেন না থাকে। মৃত্যু লগ্নে মানুষের সম্মুখে জাগতিক কিছু যেমন থাকেনা, তেমনি খোদা অন্বেষণকারীদের সামনে এ ত্বরিকা অনুযায়ী অন্য কিছু থাকে না। দ্বিতীয়তঃ যুহদ। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যেমন জাগতিক সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনি এখানেও যেন দুনিয়া ও এর কোন কিছুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। তৃতীয়তঃ তাওয়াক্কুল। মৃত্যুকালে যেমন জাহেরী আসবাব ও জাগতিক উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করতে হয়, তেমনি এ ত্বরিকা অনুযায়ী সবকিছু পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ ভরসা করতে হয়। চতুর্থতঃ কানা'আত। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যেমন কোন প্রকার নফ্সানী খাহেশ এবং রিপু প্রভৃতি অবশিষ্ট থাকে না, তেমনি এ ত্বরিকা পন্থীদের তা থাকে না। পঞ্চমতঃ আসলত। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যেমন মানুষের সঙ্গ লাভের কোন সুযোগ থাকে না, এখানেও মানুষের সংসর্গ হতে দূরে থাকতে হয়। ষষ্ঠতঃ তাওয়াজ্জুহ। অর্থাৎ মৃত্যুকালে যেমন লক্ষ্য শুধুমাত্র আল্লাহ্র দিকে নিবদ্ধ থাকে, তেমনি জগত জীবনেও এতে পরিপূর্ণ নিবদ্ধ থাকতে হয়। সপ্তমতঃ সবর। মৃত্যুকালীন সময়ের মতো এ ত্বরিকায় জাগতিক সম্ভোগ পরিত্যাগ করতে হয়। (চলবে) ❑

শতাব্দীর কাল-পরিক্রমায় শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী

[এক মহাকাব্যিক আধ্যাত্মিক অভিধানের কথকতা]

• ড. সেলিম জাহাঙ্গীর •

॥ এক ॥

ঐতিহাসিক পটভূমি

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬-১৯০৬) ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য বড় মাপের বিশেষত্ব হলোঃ তিনি মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা প্রচারের পাশাপাশি তাঁর পবিত্র বংশধারা এবং নির্বাচিত খলিফাদের মাধ্যমে এ ত্বরিকার বিশেষত্বসমূহ বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার সুব্যবস্থা করে গিয়েছেন গভীর তাৎপর্যপূর্ণভাবে। 'ছরগোরহে আউলিয়া'য় অভিষিক্ত বলে 'মারাযাল বাহরাইন' সম তাঁর পবিত্র রক্ত ও বেলায়তের অপূর্ব সম্মিলনে 'সোনায় সোহাগা'র মতো, সুবাসিত গোলাপের মতো ইতিহাসের আলোকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে কিংবদন্তিতুল্য চিরায়ত-শাশ্বত দুটো পুতঃপবিত্র নাম ঃ তদীয় পৌত্র অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (১৮৯৩-১৯৮২) এবং (তদীয় প্রথম প্রপৌত্র) শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (১৯২৮-১৯৮৮)।

সংশপ্তকের মতো ত্বরিকার তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক প্রয়োগে 'বেমেছাল' আশ্চর্যরকম এক বিশেষত্বের অধিকারী অছিয়ে গাউসুল আযম 'বেলায়তে মোত্লাকা' সহ ১০টি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশের পাশাপাশি সাংগঠনিক কৌশলী-দক্ষতা এবং ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণীয় ও সমীহ জাগানিয়া নির্বিলাস জীবন যাপনে প্রায় শতবছর ব্যাপী তাঁর জীবনকালে রীতিমতো এক অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন, যা আজ রীতিমতো গভীর গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিগণিত হয়ে উঠছে মাইজভাণ্ডারী গবেষক মহলে।

অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর এই বিস্ময়কর বিশেষত্ব কালের বিবর্তনে আরেক নবতর অবয়বে নতুন মাত্রিকতায় পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে তদীয় শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি, পঞ্চম পুত্রের প্রথম জন শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর মাধ্যমে।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর প্রথম প্রপৌত্র শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিল বেশ কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যা তাঁর আধ্যাত্মিক অবস্থানকে চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে রীতিমতো উচ্চতর তাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিগণিত হওয়ার দাবী রাখে কালের প্রবহমান ধারায়, ইতিহাসের আলোকেই।

॥ দুই ॥

আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব

স্বয়ং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র কালাম–

(১) 'আমি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিতেছি, জিয়াউল হক আমিই'।১

(২) 'আপনি উদগ্রীব হইয়াছেন কেন? আমার ক'বা, [জুব্বাটি] তাহার [জিয়াউল হক মিঞার] গায়ে পরাইয়া দিন।'২

তদীয় প্রপৌত্র শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় ধারণ করে তাঁরই মাধ্যমে নিজের নবতর বহি:প্রকাশের যে তুঙ্গীয় অভিব্যক্তি এবং একইসাথে তাঁকে সুস্থ করে তোলার যে একান্ত অভয়বাণী তার তথ্য প্রকাশিত হয়েছে স্বয়ং অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর মাধ্যমেই।৩ ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এর চেয়ে আস্থাভাজন এবং বিশ্বস্ততম তথ্যসূত্র আর কী হতে পারে?

এ ছিল বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের কথা। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী কালেরও আগের কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যপূর্ণ এই ঐতিহাসিক সত্যটি রহস্যজনক কারণে কখনো বড় বেশী পাদ-প্রদীপে আসেনি। তাসাওউফের পীঠস্থানে অবস্থান করে, তাসাওউফ বিকাশ ও চর্চার বৃহত্তর স্বার্থে, নিজেদের যথার্থ আত্ম পরিচয় ও আত্ম জিজ্ঞাসার হালখাতার মূল্যায়নের জন্য যা ছিল প্রায় অপরিহার্য, 'পথ-হারা পথিকের' 'সাহসী ঠিকানার' প্রয়োজনেই ঐকান্তিক আলোচনা-পর্যালোচনার যে ধারায় গভীর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল তাও কেন জানি হয়ে উঠেনি, অছিয়ে গাউসুল আযমের রক্তধারায় সমৃদ্ধ একটি বংশধারা সুস্থ ও স্বচ্ছল অবস্থায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও।৪

বলাবাহুল্য, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার শুদ্ধতম উচ্চারণের পরিশুদ্ধতম যে ধারা অছিয়ে গাউসুল আযম সৃষ্টি করেছিলেন এবং একক পথিক ও পথিকৃত হিসেবে যে প্রাণময়-গতিময় উদ্দীপনা-জাগানিয়া ভাব-পরিমন্ডল সৃষ্টি করে সংশপ্তকের মতো দু'হাতে কর্ম

সম্পাদনের কল্পনাতীত অতুলনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, সে বহুমাত্রিক তাৎপর্যপূর্ণ প্রবহমান ধারাকে লাখো আশেক ভক্তের চাহিদার অনুকূলে দেশে এবং বহিঃবিশ্বে বিশ্বস্ততার সাথে উপস্থাপনের প্রয়োজনে অছিয়ে গাউসুল আযমের শ্রদ্ধেয় সম্মানিত বংশধারার সুসংহত সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ সৃজনশীল কর্মপ্রয়াস ছিল বহুল আকাঙ্ক্ষিত, একান্ত কাম্য – ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষনেরই অনিবার্য দাবী।

ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায়, কালের বিচারে শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর ইতিহাস বড় বেশীদিনের নয়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তাঁর আবির্ভাব (জন্ম ১৯২৮) এবং একই শতাব্দীর নবম দশকে ওফাত (১৯৮৮); জাগতিক হিসেবে মাত্র ৬০ বছর।

৬০ বছর সময়কালে এ জগৎকে দৃষ্টি আকর্ষণীয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত, আলোড়িত এবং আধ্যাত্মিক মহিমায় ছন্দোবদ্ধভাবে আন্দোলিত করে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় রীতিমতো কিংবদন্তিতে পরিগণিত হয়েছিলেন অবিসংবাদিতভাবে। যা ছিল সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রায় সকলের হৃদয়ের পাশাপাশি মুখে মুখেও উচ্চারিত এবং অনেকের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনেও প্রতিফলিত। বলাবাহুল্য, যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আজও সমাজ জীবনের অনেকের স্মৃতিতে অম্লান, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণীয়।

॥ তিন ॥
উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব

শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর এ দুনিয়াতে আবির্ভাব এবং মহাপ্রয়ানের মোটামুটি হালখাতায় যে বিশেষত্বগুলো বিশেষভাবে স্মরণীয় তা হলো:

(১) পিতৃ-মাতৃ উভয়কূলে মাইজভাণ্ডারী শরাফতের 'মারাযাল বাহরাইন' হিসেবে একইসাথে গাউসিয়ত-কুতবিয়ত দুটোরই ধারক-বাহক হিসেবে আত্মপ্রকাশ।৫

(২) গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নবজাতকের নাম রাখা হয় জিয়াউল হক (সত্যের আলো)।৬

(৩) এ দুনিয়াতে আসার অব্যবহিত পর জন্ম-মৃত্যুর এক আশ্চর্যজনক দ্বন্দ্বমূলক ক্রান্তিলগ্নে নানা গাউসুল আযম বিল বিরাসত সৈয়দ গোলাম রহমান বাবা ভাণ্ডারীর (১৮৬৫-১৯৩৭) হস্তনিঃসৃত পানির বরকতে আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর নবজীবন লাভ।৭

(৪) আধ্যাত্মিকতার আনুষ্ঠানিক বিকাশের সূচনালগ্নে ১৯৫৩ সালে গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর স্বপ্নাদেশ এবং আধ্যাত্মিক মর্যাদার সম্মানিত প্রতীক কুবা বা জুব্বা প্রদানের নির্দেশ।৮

(৫) বাবা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর নিবীড় তত্ত্বাবধানে তাৎপর্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক পরিচর্যার পাশাপাশি পুত্রের সুগভীর আধ্যাত্মিক মহিমা বিষয়ক মন্তব্য ও আশাবাদ।৯

(৬) ১৯৬৬ সালের ৯ মাঘ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে খিলাফতের আনুষ্ঠানিক উত্তরাধিকার হিসেবে পুত্র জিয়াউল হককে অভিষিক্ত করণ।১০

(৭) ১৯৭৩ সালের ৩০ আষাঢ় পুত্রের স্বীয় মহিমা, আধ্যাত্মিকার উদ্ভিন্ন-বিকাশকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকাশের প্রয়োজনে নিজের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় বাগানবাড়িতে সপরিবারে পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা।১১

(৮) ১৯৭৪ সালের ৬ এপ্রিল ভক্তদের উদ্দেশ্যে স্বীয় পুত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলেন: বৈশাখের ১ তারিখ থেকে একটা নতুন যুগের সৃষ্টি হচ্ছে, আমি খেদমতের জিম্মাদারী ছেড়ে দেব।১২

(৯) বাবা অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবন সায়াহ্নে স্বীয় আধ্যাত্মিক মহিমার বহি:প্রকাশ হিসেবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বাবার ১২ বছর নতুন জীবন প্রাপ্তির আধ্যাত্মিক অনুঘটক।১৩

(১০) রহস্যপূর্ণ খিজরী ত্বরিকার লক্ষণাক্রান্ত মহাসমুদ্ররূপী মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সৃজনশীল বিকাশমান ধারায় স্থান-কাল-পাত্রের আলোকে এ ত্বরিকাকে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে নবতর ইতিহাস সৃষ্টি।১৪

(১১) প্রচলিত নাস্তিক্যতাবাদ ও বস্তুবাদী চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীতে মহান স্রষ্টার প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের ধারাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে কালোপযোগী উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পবিত্র কালাম (বাণী) উচ্চারণ।১৫

(১২) তাঁর শেষ জীবনে স্রষ্টার সাথে মিলনের অভূতপূর্ব অপূর্ব দৃশ্য, মাইজভাণ্ডার-এর ইতিহাসে স্মরণকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নামাযে জানাযা।১৬

॥ চার ॥
কারামত

শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারামতের বিষয় পরিলক্ষিত হতো। যাদের সাথে এই সমস্ত কারামতের ঘটনা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকত। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযাগ্যে ৬০টি কারামত সংগ্রহ করে তাঁর জীবনীগ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উল্লেখযাগ্যে কয়েকটি